بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ মোতাবেক ১৮ তাবুক, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ তা'লার ওপর পূর্ণ তাওয়াক্কুল (ভরসা)-এর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বিগত খুতবায় আমি মক্কা থেকে তাঁর হিজরত সংক্রান্ত ঘটনাবলি বর্ণনা করেছিলাম। সেই সফরের আরও কিছু বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসে সংরক্ষিত আছে, যা থেকে তাঁর তাওয়াক্কুলের (খোদানির্ভরতার) আরো একটি মহান দিক ফুটে ওঠে। রেওয়ায়েতে রয়েছে, এই হিজরতের সময় সুরাক্বা বিন মালিক পুরস্কারের লোভে মহানবী (সা.)-এর পিছু ধাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় । পরবর্তীতে সুরাক্বা বিন মালিক নিজেই ইসলাম গ্রহণের পর এই ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কুরাইশ কাফেরদের দূত আমাদের নিকট আসে। তারা মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) উভয়ের মাথার মূল্য নির্ধারণ করে দেয় অর্থাৎ তাদের জন্য যারা তাঁদের উভয়কে হত্যা করবে বা বন্দী করতে পারবে, তাকে প্রত্যেকের বিনিময়ে একশত উটের রক্তপণ (পুরস্কার) প্রদান করা হবে।' সুরাক্বা বলেন, 'আমি আমার গোত্র **বনু মুদলিজের** এক বৈঠকে বসা ছিলাম। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে আমাদের সামনে দণ্ডায়মান হয়। সে বলে, হে সুরাক্বা! আমি উপকূলের দিকে ছায়াসদৃশ কিছু দেখেছি− অথবা বলেছে যে, তিনজনের এক কাফেলাকে যেতে দেখেছি। আমার মনে হয় তারা মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সঙ্গী হবেন। সুরাক্বা বিন মালিক বলেন, আমি বুঝতে পারি− নিশ্চিতভাবেই এটি মুহাম্মদ (সা.)-এরই কাফেলা। কিন্তু অন্য কেউ আমার সাথে এই পুরস্কারে ভাগ বসাবে− আমি তা চাই নি। তাই আমি তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতির সংবেদনশীলতাকে নিয়ন্ত্রণ করলাম আর সংবাদদাতাকে চোখের ইশারায় চুপ থাকার ইঙ্গিত করলাম; ফলে সে চুপ হয়ে যায়। অবশ্য আমি প্রকাশ্যে বলি নি যে, "না না, এটি মুহাম্মদ (সা.)-এর কাফেলা হতে পারে না; বরং তুমি যাদের কথা বলছ তারা তো সবেমাত্র আমাদের সম্মুখ দিয়ে গেল –তারা অমুক গোত্রের লোক, যারা হারিয়ে যাওয়া উট খুঁজতে বেরিয়েছে। সুরাক্বা বলেন, আমি আরও কিছুক্ষণ সেই মজলিসে বসে রইলাম যেন কারও মনে কোনো সন্দেহ না জাগে। এরপর আমার এক সেবিকাকে চুপিসারে বললাম, তুমি আমার অমুক দ্রুতগামী ঘোড়াটি নিয়ে বাড়ির পেছনে অমুক স্থানে আমার অপেক্ষা কর। কিছুক্ষণ পর আমি নিজে সেখানে গিয়ে পৌঁছালাম। আমি তির দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম, কিন্তু ভাগ্য গণনা সফরের যাওয়ার বিরুদ্ধে বের হলো। তবুও আমি সেটিকে গুরুত্ব না দিয়ে ঘোড়ায় আরোহন করে বাতাসের গতিতে ছুটতে থাকলাম এবং সেই কাফেলার পিছু নিলাম, যাকে আমি হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এরই কাফেলা বলে মনে করছিলাম। সুরাকা বলেন, একে একে মাইলফলক অতিক্রম করে আমি খুব দ্রুত সেই কাফেলার কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম। কাফেলার অদূরে অপ্রত্যাশিতভাবে আমার ঘোড়াটি হোঁচট খেল এবং আমি ছিটকে মাটিতে পড়ে গেলাম। আমি উঠে দাঁড়ালাম এবং পুনরায় তির দিয়ে ভাগ্য যাচাই করলাম। এবারও ফল আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বেরোলো। কিন্তু আমি যেকোনো মূল্যে মুহাম্মদ (সা.)-কে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে একশত উটের পুরস্কার লাভ করার বিষয়ে দৃঢ়সংকল্প ছিলাম। তাই আবার উঠে ঘোড়ায় চেপে বসলাম। 'এবার আমি

এত কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম যে আমি পরিস্কারভাবে শনাক্ত করতে পেরেছিলাম, তারা মুহাম্মদ (সা.) ও আবু বকর (রা.); কেবল তা-ই নয়, বরং মহানবী (সা.)-এর কুরআন তিলাওয়াতের সুমধুর কণ্ঠস্বরও শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি (সা.) এদিক-ওদিক তাকাননি, কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) বারবার পেছনে ফিরে তাকাচ্ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিরাপত্তার চিন্তায় হয়তো চারদিকে তাকাচ্ছিলেন। সুরাক্বা বলেন, এমন সময় আমার ঘোড়াটি আবার হোঁচট খেল এবং এর পা বালির গভীরে দেবে গেল। আমি আবারও ছিটকে পড়লাম। এরপর আমি ঘোড়াকে ধমক দিয়ে নিজে উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু ঘোড়াটির জন্য বালি থেকে পা বের করা অনেকটা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। অবশেষে যখন সে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তখন তার দুই পায়ের নিচ থেকে ধুলো উড়ে আকাশে ধোঁয়ার মতো ছড়িয়ে পড়ল। আমি পুনরায় তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করতে গেলে এবারও সেটাই বের হলো যা আমি অপছন্দ করতাম। তখন আমি সেখান থেকেই নিরাপত্তা চেয়ে চিৎকার করে বললাম, আমার হাতে আপনাদের কোনো ক্ষতি হবে না। এতে রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, তাকে জিজ্ঞাসা করো সে কী চায়। সুরাক্বা বলল, আমি সুরাক্বা, আমি আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই। তখন তাঁরা থামলেন। সুরাক্বা বলে, মক্কাবাসীরা আপনাদের জীবিত বা মৃত ধরে আনতে পারলে একশত উট পুরস্কার দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে এবং আমি সেই লোভেই আপনাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য এসেছি। কিন্তু আমার সাথে যা যা ঘটেছে, তা দেখে আমি এই দৃঢ় বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে আপনাদের পিছু ধাওয়া করা সঠিক নয়। সে মহানবী (সা.)-এর কাছে পাথেয় বা রসদ অর্থাৎ পানাহার দ্রব্য গ্রহণের প্রস্তাবও দিল, কিন্তু মহানবী (সা.) তা গ্রহণ করলেন না। তিনি (সা.) কেবল এতটুকু বললেন, আমাদের খবর অন্য কাউকে দেবে না। সুরাক্বা এই প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করল এবং একইসাথে নিবেদন করলো যে, আমার বিশ্বাস, একদিন আপনি অবশ্যই রাজত্ব লাভ করবেন আমাকে এইমর্মে একটি নিরাপত্তানামা লিখে দিন, যে আমি তখন আপনার সকাসে উপস্থিত হলে আমার সাথে সম্মানজনক আচরণ করা হবে।' কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুযায়ী, সে নিরাপত্তার লিখিত অঙ্গীকারনামা চেয়েছিল। তদনুসারে মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে হযরত আবু বকর (রা.) এবং অন্য একটি রেওয়ায়েত অনুসারে হযরত আমীর বিন ফুহাইরা (রা.)–তাকে লিখে দিয়েছেন এবং সে সেটি নিয়ে ফিরে যায়। এটিই ছিল মহানবী (সা.)-এর খোদানীর্ভরতার মহিমা! মনে কোনো ভয় ছিল না। মহান আল্লাহর বাণী পাঠ করতে করতে তিনি পথ চলছিলেন। তাঁর হৃদয়ে এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁর কোন ক্ষতি হতে পারে না। সুরাক্বা যখন নিরাপত্তানামা চাইল, তিনি তাকে নিরাপত্তানামা লিখে দিলেন। সুরাক্বার হৃদয়ে এই ধারণা জেগেছিল যে, শেষ পর্যন্ত তাঁরই জয় হবে আর মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে এর চেয়েও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে বিজয় নিশ্চিতভাবেই তাঁরই, তাই তিনি নিরাপত্তানামা লিখে দিয়েছিলেন।

অপর এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী, সে যখন ফিরে যাচ্ছিল তখন মহানবী (সা.) তাকে সম্বোধন করে বললেন, হে সুরাক্বা! সেদিন তোমার অবস্থা কত ঈর্ষণীয় হবে যখন কিসরার (পারস্য সম্রাটের) কঙ্কণ তোমার হাতে পরিহিত থাকবে? সুরাক্বা বিস্ময়ে পেছনে ফিরে জিজ্ঞেস করল, কিসরা বিন হরমুযের কঙ্কণ? তিনি (সা.) বলেন, হ্যাঁ, সেই কিসরা বিন হরমুযেরই। পরবর্তীতে হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে যখন কিসরার কঙ্কণ, মুকুট ও কোমরবন্ধনী আনা হলো হলো, তখন হযরত ওমর (রা.) সুরাক্বাকে ডেকে পাঠালেন এবং বলেন, "তোমার হাত দাও। তিনি তাঁর হাতে সেই কঙ্কণ পরিয়ে দিয়ে বলেন, বলো, সমস্ত

প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি কিসরা বিন হরমুযের কাছ থেকে এগুলো নিয়ে আমাকে দান করেছেন।

হিজরতের সফরের এই ঘটনাকে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-ও নিজের ভাষায় এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, হিজরতের ঘটনা এক বিস্ময়কর ভীতিজাগানিয়া ঘটনা। সমগ্র আরব তাঁর বিরোধী ও রক্তপিপাসু ছিল; কিন্তু মহানবী (সা.) মাত্র একজন সঙ্গী নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। পথিমধ্যে এমন সব গোত্র বসবাস করত, যারা ধর্মীয় বিরোধের কারণে সর্বদা তাঁকে হত্যা করার সুযোগ খুঁজত এবং কেবল কুরাইশদের ভয়ে চুপ থাকত। কিন্তু এরপর এমন এক সময় এসেযায় যখন স্বয়ং কুরাইশরা তাঁর প্রাণনাশে উদ্যত ছিল। সমস্ত আরব গোত্র নিশ্চিৎ ছিল যে, আমরা যদি এই ব্যক্তিকে হত্যা করি তবে কুরাইশদের অসন্তুষ্ট হওয়ার কোনো কারণ থাকবে না। কেবল এটি নয় যে কুরাইশদের অসন্তোষের কোন ভয় ছিল না বরং মহানবী (সা.)-কে মক্কায় অনুপস্থিত দেখে তারা তাঁকে হত্যার জন্য বিপুল পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছিল। মদীনার পথে বসবাসকারী সমস্ত গোত্রকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, যে ব্যক্তি মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে জীবিত বা মৃত ধরে আনবে, তাকে মাথাপিছু ১০০টি করে উট পুরস্কার দেওয়া হবে। আরব গোত্রগুলো যাদের জীবনধারণের প্রধান উপায়ই ছিল লুটপাট এবং যারা হিংসার আগুনে আগেই জ্বলছিল, তারা কি এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে পারত? চারদিকে তাঁর সন্ধান শুরু হলো। একথায় তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে এই আশংকা ছিল, যেকোনো সময় যেকোন রক্তপিপাসু শত্রুর মুখোমুখি হতে হবে। এমন স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে প্রায়শই দেখা যায়, পরম বীর পুরুষরাও মনোবল হারিয়ে বসে এবং শেষ চেষ্টাটুকু করে উঠতে পারে না। আর যদি ব্যতিক্রম হিসেবে কেউ অতি সাহসী ও শক্তিশালী হৃদয়ের মানুষও হয়, তার ওপরও ভয় এমনভাবে চেপে বসে যে, তার প্রতিটি গতিবিধি থেকে তা প্রকাশ পায়।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) লিখেছেন, আমি ইতিহাসে বহু মহান বীরের জীবনের ঘটনা পড়েছি, কিন্তু এমন সংকটের মুহূর্তে তাঁদের যে অবস্থা হতো, মহানবী (সা.)-এর ঘটনার সাথে এর তুলনা করাও সমীচীন নয়। ঐতিহাসিকরা জানেন, পলায়নরত নেপোলিয়নের কী দশা হয়েছিল এবং তার চেহারায় হতাশার কেমন সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠেছিল। তারা এটিও জানে যে, ভারত উপমহাদেশের সম্রাট হুমায়ূন কীভাবে বারবার নিজেকে শত্রুর হাতে সঁপে দিতে প্রস্তুত হয়ে যান। তাঁর সাথে যদি কয়েকজন অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেনাপতি না থাকতো, তবে হয়তো তিনি তা-ই করে বসতেন। একইভাবে আরও বহু বীর সেনাপতি অতিক্রান্ত হয়েছেন, সংকটের মুহূর্তে যখন শত্রু চারদিক থেকে তাঁদের খোঁজে ছড়িয়ে পড়ে তাঁরা ঘাবড়ে যায়। কিন্তু মহানবী (সা.) এই পার্থিব লোকদের মতো ছিলেন না। তাঁর দৃষ্টি ইহজগতের দিকে নিবদ্ধ ছিল না, বরং তাঁর দৃষ্টি ছিল মহান আল্লাহর নিবদ্ধ। জাগতিক উপায়উপকরণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি আদৌ ভাবেন নি , এমন সংকটাপন্ন মুহূর্তে অসহায় অবস্থায় কেবল একজন সঙ্গীকে নিয়ে আমি কী-ই বা করতে পারি? কিংবা এমন বিপজ্জনক পথে যদি শত্রু সামনে এসে পড়ে তবে তার মোকাবেলার জন্য আমার কী আয়োজন আছে! বরং তিনি দেখছিলেন যে, আমার সাথে সেই খোদা আছেন, যিনি চিরকাল থেকে তাঁর নেক বান্দাদের রক্ষক হিসেবে বিরাজমান এবং যার আঘাতের সামনে কোনো শত্রু টিকতে পারে না। সেই খোদা নূহের খোদা, ইব্রাহীমের খোদা, মূসার খোদা, ইউনুসের খোদা, আইয়ূবের খোদা, দাঊদের খোদা, সোলায়মানের খোদা, মসীহ্‌র খোদা –তিনিই আমার খোদা! তাঁর শক্তি কখনো হ্রাস পায় না এবং তিনি এক মুহূর্তের জন্যও উদাসীন নন।

সুরাক্বা বিন জু'শুম লোভ ও শত্রুতায় উন্মত্ত হয়ে ছুটে আসে এবং দূর থেকে দেখে মহানবী (সা.)-এর দিকে ঘোড়া ছুটায়। তার হৃদয়ে প্রত্যাশার উত্তাল তরঙ্গ খেলছিল যে, সে কেবল নিজ ধর্মের অবমাননাকারীর রক্তে হাত রঞ্জিত করে নিজের হৃদয়ের আগুনকে ঠাণ্ডা করতে চায় না, বরং ২০০ উটের পুরস্কারও লাভ করবে –অর্থাৎ ১০০ উট হযরত মহানবী (সা.)-এর জন্য এবং ১০০ উট হযরত আবু বকর (রা.)-এর জন্য নির্ধারিত ছিল। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) ২০০ উটের কথা উল্লেখ করেছেন। (প্রথম বর্ণনায় ১০০ উটের কথা আছে, তবে এখানে ২০০ উটের কথা রয়েছে অর্থাৎ দুজনের জন্য জনপতি ১০০ করে মোট ২০০ উট)।

এই বিপুল পুরস্কার যা তাকে নিজ গোত্রে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল–তার সাহসকে আরও বৃদ্ধি করে। শিকারী যেমন শিকার দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, সেও মহানবী (সা.) -কে দেখে তাঁর দিকে ধেয়ে আসে এবং ধনুক-তির হাতে নিয়ে তাঁর ওপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। সে একা ছিল না, বরং একটি হাঁক দিয়ে তার চারপাশে হাজার হাজার মানুষকে জড়ো করতে পারত। সে ডাক দিলে তবে আশেপাশের গোত্রের লোকজন কাছাকাছিই ছিল, তারা চলে আসত; কারণ মহানবী (সা.) তখন তাদের এলাকা অতিক্রম করছিলেন। কিন্তু মহানবী (সা.) তখন কী করেন? তিনি কি পালিয়ে যান? ভয়ে কি নিজেকে তার হাতে তুলে দিয়েছিলেন? তাঁর পা কি দোদুল্যমান হয়? তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধি কি লোপ পেয়েছিল? তাকে হত্যা করে পালানোর পথ খোঁজার ইচ্ছা করেন কি? সে তখন একা এত কাছে এসে গিয়েছিল যে মহানবী (সা.)-ও তাকে তির মেরে বধ করতে পারতেন! না, খোদার ওপর পূর্ণ ভরসাকারী সেই মহামানব এসবের একটি কাজও করেননি। তিনি সুরাক্বাকে তুচ্ছ এক ষাড়ের সমপরিমাণ গুরুত্বও দেননি! হযরত আবু বকর (রা.)-এর মধ্যে অত বিপুল সাহস ও বীরত্ব থাকা সত্ত্বেও, তাঁর মধ্যে যে ঈমান, একীন ও তাওয়াক্কুল বিদ্যমান ছিল তা সত্ত্বেও তিনি বারবার পেছনে ফিরে দেখছিলেন যে, সুরাক্বা আমাদের অনেক কাছে এসে গিয়েছে। কিন্তু মহানবী (সা.) তার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা করেন নি, ভয় পাওয়া বা পালিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, তাঁর চেহারায় ভয়ভীতির চিহ্নও প্রকাশ পায়নি; তিনি একবার মুখ ফিরিয়েও তার দিকে তাকাননি! এটি সুরাক্বাকে চরম বিস্ময়ের সাগরে নিমজ্জিত করল এবং তার চোখ খুলে দিল যে, আমি কোন্ মানুষের পিছু ধাওয়া করছি! জীবনভর সে স্মৃতি থেকে এই দৃশ্য মুছে ফেলতে পারেনি। বরং এই অলৌকিক ঘটনা তার হৃদয়ে এমন গভীরভাবে রেখাপাত করে যে, সে সবসময় তা বর্ণনা করত এবং বলত, আমি ঘোড়া ছুটিয়ে মহানবী (সা.) -এর এত কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলাম যে, তাঁর কুরআন তিলাওয়াতের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলাম। আমি দেখলাম, মহানবী (সা.) ডানে-বামে মোটেই তাকান না ; অবশ্য হযরত আবু বকর (রা.) বারবার তাকাচ্ছিলেন। কত অসাধারণ বিষয়, মহান আল্লাহর ওপর কত নিটোল ভরসা! শত্রু ঘোড়া ছুটিয়ে এত নিকটে চলে এসেছে যে মহানবী (সা.)-এর কণ্ঠস্বর তার কান পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছিল এবং তিনি (সা.) তিরের লক্ষ্যের ভেতর ; অথচ তিনি ঘাবড়ানো তো দূরের কথা, পক্ষান্তরে তিনি কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করে চেলেছেন আর অপরদিকে হযরত আবু বকর (রা.) বারবার তাকাচ্ছিলেন যে শত্রু কতই না কাছে এসে গেছে। এই ভরসা ও তাওয়াক্কুলের আর কোনো দৃষ্টান্ত আছে কি? এমন কোনো মানুষ কি আছে, যে এরূপ বিপজ্জনক মুহূর্তে এমন পরম অনবধানতা ও ভ্রুক্ষেপহীনতা প্রদর্শন করে থাকবে? যদি তাঁর মনে জাগতিক উপায়-উপকরণ ব্যবহারের সামান্য চিন্তাও থাকত, তবে অন্তত এতটুকু তো হওয়া উচিত ছিল যে তিনি সেসময় হয় সুরাক্বার ওপর আক্রমণের চেষ্টা করতেন, নয়তো

সেখান থেকে দ্রুত সরে পড়ার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তিনি (সা.) এই দুটি বিষয়ের একটিও করেননি। না তিনি (সা.) গতি বৃদ্ধি করেছেন, আর না তিনি এই সংকল্প করেছেন যে, কোনোভাবে সুরাকাকে হত্যা করবেন; বরং অত্যন্ত প্রশান্তির সাথে, কোনো প্রকার ভয়-ভীতি প্রকাশ না করে, নিজের পূর্বের গতিতে কুরআন শরীফ পড়তে পড়তে চলতে থাকেন।

সেটি কোন্ শক্তি ছিল, যা তাঁর (সা.) মনোবলকে এতটা দৃঢ় করে দিয়েছিল? সেটি কোন্ প্রেরণা ছিল, যা তাঁর (সা.) মাঝে এমন অসাধারণ জীবনের সঞ্চার করেছিল? এগুলো ছিল খোদার ওপর তাওয়াক্কুলের বিস্ময়কর নিদর্শন, তাঁর ওপর নির্ভরতার ফলাফল। তিনি (সা.) জানতেন যে, বাহ্যিক উপকরণগুলো আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। জাগতিক শক্তিগুলো আমাকে ধ্বংস করতে পারবে না। কেননা উর্ধ্বলোকে একজন খোদা আছেন যিনি আমাকে দেখছেন, যিনি এই সমস্ত উপকরণের স্রষ্টা। অতএব, উপকরণের স্রষ্টার বিরুদ্ধে উপকরণ কিছুই করতে পারে না। তাঁর (সা.) এই তাওয়াক্কুল বৃথা যায়নি, বরং খোদা তা পূর্ণ করেছেন। আর সুরাকা, যে দুইশত উটের লোভে এসেছিল, সে তাঁর (সা.) কাছে ক্ষমা চেয়ে ফিরে যায়। আর খোদা তার হৃদয়ে এমন ভীতির সঞ্চার করেছিলেন যে, সে চুপচাপ ফিরে যাওয়ার মাঝে মঙ্গল নিহীত বলে মনে করেছে; বরং সে অন্যান্য পশ্চাদ্ধাবনকারীদেরও ফিরিয়ে দিয়েছিল।

এটি সেই তাওয়াক্কুল, যা একজন মিথ্যাবাদীর মাঝে থাকতে পারে না, যা একটি প্রতারক হৃদয়ে বিরাজমান থাকতে পারে না। এটি সেই তাওয়াক্কুল, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যায় না। হযরত মূসা (আ.)-এর জীবনেও একবার এই ধরণের তাওয়াক্কুলের দৃষ্টান্ত দেখা যায় কিন্তু সেই দৃষ্টান্ত এর তুলনায় অনেক তুচ্ছ। কেননা, হযরত মূসা (আ.)-এর সঙ্গীরা ফেরাউনীদের দেখে বলেছিল, إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ‘অর্থাৎ আমরা নিশ্চিত ধরা পড়ে গেলাম!’ (সূরা আশ শুআরা ২৬:৬২) এতে হযরত মূসা (আ.) উত্তরে বলেছিলেন, إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ অর্থ- *নিশ্চয় আমার প্রতিপালক-প্রভু আমার সাথে আছেন, আর অবশ্যই তিনি আমাকে (সঠিক) পথ দেখাবেন*। (সূরা আশ-শুআরা ২৬:৬৩) কিন্তু রসূলুল্লাহ (সা.)-এর তাওয়াক্কুল এতটা পূর্ণাঙ্গীন ছিল যে, সেটি তাঁর সঙ্গীদের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করে আর হযরত আবু বকর (রা.) মূসা (আ.)-এর অনুসারীদের মতো ঘাবড়ে গিয়ে এ কথা বলেন নি যে, আমরা নিশ্চয় ধরা পড়ে যাবো। বরং গুহায় বসে এ কথা বলেছেন, তারা যদি নীচে তাকায় তাহলে আমাদের দেখে ফেলবে। এই ঈমান সেই প্রতিফলনের ফলাফল ছিল যা সে সময় নবুওয়্যতের জ্যোতি তাঁর অন্তরে সৃষ্টি করছিল। দ্বিতীয়ত, হযরত মূসা (আ.)-এর সাথে সেনাবাহিনী ছিল আর তাদের সম্মুখে পালিয়ে যাওয়ার মতো স্থান নিশ্চিতভাবেই বিদ্যমান ছিল। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর সাথে কোন জামাত ছিল না, আর তাঁর সম্মুখে অন্য কোন পথও ছিল না। অতএব, এই হলো তাঁর তাওয়াক্কুলের অসাধারণ মর্যাদা।

বাহ্যিক উপকরণের ব্যবস্থা করা ও ব্যবহার করা এরপর আল্লাহ্ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল করা, এটি জরুরী বিষয়। মহানবী (সা.)-এর তাওয়াক্কুলের উল্লেখ করতে গিয়ে এই গূঢ় কথাটি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এভাবে বর্ণনা করেছেন, সে ব্যক্তি যাঁর খোদা তা'লার সত্তার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস থাকে, আবার একইসাথে তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাসও থাকে যে, আমাকে তিনি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে কিভাবে কর্ম পরিত্যাগ করতে পারে? সে তো কর্মশক্তিতে সবচেয়ে বলিয়ান হয়ে থাকে। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কর্ম তাঁর ঈমানের জোরে ছিল। কেননা, যে ব্যক্তি বিশ্বাস করেন যে, একজন খোদা রয়েছেন আর তিনি

আমাকে বিশেষ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, সে সেই উদ্দেশ্য অর্জন করার জন্য চেষ্টাও করে। লক্ষ্য করে দেখ! মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) যেখানে ঈমানের বহিঃপ্রকাশ করেন সেখানে সওর গুহায় বসে হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, আবু বকর! ভয় পেয়ো না। খোদা আমাদের সাথে আছেন। তিনিই আমাদের রক্ষক। সেখানে তিনি (সা.) ধর্মের অন্যান্য কাজে দিন রাত এতটা ব্যস্ত থাকেন যে মনে হয় যেন, খোদা তা'লার সকল কাজ তাঁর ওপরেই ন্যস্ত করা হয়েছে। একদিকে যদি তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস থেকে থাকে যে, খোদা আছেন আর তিনি নিজ বান্দাদের সাহায্য করেন, অপরদিকে তিনি খোদার পরীক্ষা নিচ্ছেন এমনটা চোখে পড়ে না। এমন নয় যে, খোদা বলেছেন, আমি অবশ্যই তোমাকে বিজয় দান করবো, তাই পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকবেন আর বলবেন, এখন বিজয়ের জন্য কোন পরিশ্রম করার কী প্রয়োজন রয়েছে? আল্লাহ্ নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী স্বয়ং বিজয় দান করবেন। তিনি (সা.) এমনটি করেন নি। বরং বিজয়ের জন্য সংগ্রামও করেছেন। তিনি (সা.) লোকদের যুদ্ধের কলা কৌশল শিখিয়েছেন, সেনাবাহিনীর প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, শত্রুদের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় সেনাবাহিনী একত্রিত করেছেন, বাহনের ব্যবস্থা করেছেন, অস্ত্র একত্রিত করেছেন, সৈন্যদের রশদ ও আবাসন প্রভৃতির ব্যবস্থা করেছেন। এ সমস্ত ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করার পর শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করতে যান আর যখন এমন কোন সময় আসে যখন শত্রু সংখ্যায় বেশি আর সাহাবীরা সংখ্যায় স্বল্প, তখন তিনি অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা এবং ঈমানের সাথে বলেন, আমরা সংখ্যায় অল্প হওয়া সত্ত্বেও বিজয় আমাদেরই হবে। কাজেই মানবিক কৌশল ও চেষ্টাপ্রচেষ্টা যতটুকু করা সম্ভব ছিল, তিনি তার সবই করতেন এবং এরপর আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করতেন। অতএব, তাঁর ঈমান অজ্ঞতা ও অলসতাপূর্ণ ঈমান ছিল না, বরং তাঁর ঈমান পর্যবেক্ষণমূলক ঈমান ছিল। আর অভিজ্ঞতালব্ধ ঈমান সেই ব্যক্তিরই হয়ে থাকে যে একইসাথে তাওয়াক্কুলও করে, আবার কাজেও লেগে থাকে। অর্থাৎ, তাওয়াক্কুল ও কর্ম একই সাথে করে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, "সেই বিপদসঙ্কুল যুগ যা আমাদের মহানবী (সা.)-এর ওপর তেরো বছর যাবত মক্কাতে বিরাজমান ছিল,

সেই যুগের ইতিহাস পাঠ করলে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে জানা যায়, মহানবী (সা.) কঠিন বিপদের সময় একজন পূর্ণ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির যেসব নৈতিক গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ করা উচিত, অর্থাৎ আল্লাহ্র ওপর ভরসা রাখা, হা হুতাশ ও অস্থিরতা থেকে দূরে থাকা, নিজের কাজে অলসতা বা দুর্বলতা না দেখানো এবং কারো ভয়ে ভীত না হওয়া ইত্যাদি গুণ তিনি এমনভাবে প্রদর্শন করেছিলেন যে, কাফিররা তাঁর এই দৃঢ়তা দেখে ঈমান আনয়ন করেছিল এবং তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আল্লাহ্র ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ভরসা না থাকলে কেউ এ ধরনের অবিচলতা প্রদর্শন করতে পারে না এবং এরূপ দুঃখ-কষ্ট সইতেও পারে না। মহানবী (সা.) আল্লাহ্র ওপর ভরসা রাখার পাশাপাশি উপায়-উপকরণেরও সদ্ব্যবহার করেছেন। এ বিষয়ে যেমনটি আমি বলেছি বিভিন্ন ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে একটি হাদিসও রয়েছে যা হযরত উবাই বিন কাব (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি (রা.) বলেন, যখন মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবিগণ মদিনায় আসেন এবং আনসাররা তাঁদের নিজেদের কাছে আশ্রয় দেন, তখন সমগ্র আরব তাঁদের বিরুদ্ধে লড়ার জন্য সমবেত হয়ে যায়। মুসলমানদের অবস্থা এমন ছিল যে তাঁরা অস্ত্র ছাড়া রাত কাটাতেন না এবং সকালেও সসস্ত্রই থাকতেন। ঘুমন্ত কিংবা জাগ্রত সব অবস্থাতেই তাঁরা অস্ত্র সাথে রাখতেন। তাঁদের আল্লাহ্র ওপর পূর্ণ ভরসা ছিল। পাশাপাশি তাদের এ ব্যাপারে সতর্কও থাকতে হতো, যে কোনো সময় আক্রমণ হতে পারে। তাই তাঁদের সর্বদা সজাগ ও প্রস্তুত থাকতে হতো এবং নিজেদের সুরক্ষার ব্যবস্থাও করতে হতো।

এ বিষয়ে হযরত আয়েশা (রা.)-এর একটি বর্ণনায় আরও বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। তিনি বলেন, যখন হযরত মহানবী (সা.) মদিনায় আসেন, তখন এক রাতে তিনি জাগ্রত ছিলেন। এরপর তিনি (সা.) বললেন, হায়! আমার সাহাবিদের মধ্যে যদি কোনো পুণ্যবান ব্যক্তি আজ রাতে আমাকে পাহারা দিত! হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, সেই অবস্থায় হঠাৎ অস্ত্রের ঝনঝনানি শব্দ শুনতে পেলাম। মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কে? উত্তর এলো, আমি **সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস**। মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, কোন বিষয়টি তোমাকে এখানে আসতে উদ্বুদ্ধ করেছে? তিনি (রা.) নিবেদন করেন, আপনার নিরাপত্তা নিয়ে আমার চিন্তার উদ্রেক হয়েছিল। তাই আপনার পাহারার জন্য উপস্থিত হয়েছি। মহানবী (সা.) তখন তাঁর জন্য দোয়া করেন। এরপর তিনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন। অপর এক রেওয়াতে হযরত আয়েশা (রা.) এই ঘটনাটি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি অস্ত্রের ঝংকার শুনতে পেলাম। তখন মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন, কে? তাঁরা উত্তর দিলেন, **সাদ ও হুযাইফা**। *অর্থাৎ এই বর্ণনায় দুইজন ব্যক্তির কথা এসেছে।* আমরা আপনার (সা.) পাহারার জন্য এসেছি। এরপর মহানবী (সা.) ঘুমিয়ে পড়েন, এমনকি আমি তাঁর গভীর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই। এ সময়েই এই আয়াত নাযিল হলো। *অর্থাৎ ওহী নাযিল হওয়ার সময় তাঁর (সা.) নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস এমন হতো।* তিনি বলেন, এ সময়েই এই আয়াত وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (সূরা মায়েদা-৬৮) অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ আল্লাহ তোমাকে সে সকল মানুষদের (অনিষ্ট) থেকে রক্ষা করবেন । মহানবী (সা.) তখন তাঁবু থেকে মাথা বের করে বললেন, হে লোকসকল! এবার ফিরে যাও, আল্লাহ্ তা'লা আমার সুরক্ষার দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত নিশ্চয়তা বিধান করা হয় নি, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে কোনো শুভসংবাদ পাওয়া যায় নি, ততক্ষণ তিনি পাহারার ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু যখন আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে তাঁকে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেওয়া হলো, তখন তিনি বললেন, তোমরা চলে যাও, এখন আল্লাহ্ তা'লা আমার সুরক্ষা করবেন।

মহানবী (সা.) যখন বিভিন্ন রাজা-বাদশাহদের কাছে ইসলামের প্রচারমূলক পত্র প্রেরণ করেন, তখন পারস্যের সম্রাট কিসরা চরম অহংকারবশত তাঁর পত্রটি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। যখন মহানবী (সা.) এই ঘটনা সম্পর্কে জানতে পারেন, তখন তিনি খোদা তা'লার প্রতি পূর্ণ ভরসা রেখে বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের টুকরো টুকরো করে দিন। কিসরা ইতিমধ্যে ইয়েমেনের গভর্নরের মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে গ্রেফতার করার উদ্দেশ্যে দুজন সৈন্যকে পত্র সহকারে পাঠিয়েছিল।

তিনি চিঠির বিষয়বস্তু শুনেন, যাতে লেখা ছিল– অনতিবিলম্বে তাদের হাতে নিজেকে তুলে দিন। এ বিপজ্জনক মুহূর্তে মহানবী (সা.) কোনো প্রকার ভয়ভীতি প্রকাশ না করে দূতদের বললেন, আজ রাতে তোমরা এখানেই অবস্থান করো, কাল সকালে আমি তোমাদের উত্তর দেবো। পরদিন সকালে তিনি দূতদের বললেন, তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের মনিব তথা ইয়েমেনের গভর্ণরকে (অর্থাৎ ইয়েমেনের শাসকের মাধ্যমে বাদশা বার্তা পাঠিয়েছিলেন) গিয়ে বলো, আমার প্রতিপালক-প্রভু আজ রাতে তোমার প্রভুকে অর্থাৎ কিসরা-কে হত্যা করেছেন। তারা একথা শুনে হতবাক হয়ে যায় এবং সেখান থেকে ফিরে যায়। পরবর্তীতে জানা গেল, ঠিক ওই রাতেই খসরু পারভেজকে তার নিজের ছেলে সাইরাস হত্যা করেছিল। এ মহান ঘটনাটি আল্লাহ তা'লা কর্তৃক তাঁর অলৌকিক নিরাপত্তা এবং মহানবী (সা.)-এর খোদাভরসার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

মহানবী (সা.) পূর্ণ তাওয়াক্কুল নিয়ে আল্লাহর অনুমতিক্রমে যুদ্ধে যেতেন এবং বের হওয়ার সময় দোয়াও করতেন। এই বিষয়ে হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা.) যখন কোনো যুদ্ধে বের হতেন, তখন বলতেন, اللَّهُمَّ أَنْتَ عَضُدِي وَأَنْتَ نَصِيرِي وَبِكَ أُقَاتِلُ *অর্থ: হে আল্লাহ! তুমিই আমার বাহু এবং তুমিই আমার সাহায্যকারী আর তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি*। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মানুষের বিপদের সময় অস্থিরতা বা ব্যাকুলতা তৈরি হওয়া স্বাভাবিক হলেও তাওয়াক্কুলকে কখনো হাতছাড়া করা উচিত নয়। মহানবী (সা.)- এর বদর যুদ্ধের সময় চরম উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছিল; যেমন তিনি আকুল মিনতি জানিয়ে দোয়া করেন, يَا رَبِّ إِنْ أَهْلَكْتَ هَذِهِ الْعِصَابَةَ فَلَنْ تُعْبَدَ فِي الْأَرْضِ أَبَدًا অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! তুমি যদি এই ছোট দলটিকে ধ্বংস করে দাও, তবে আর কখনোই পৃথিবীতে তোমার ইবাদত করা হবে না। কিন্তু মহানবী (সা.)-এর এই ব্যাকুলতা ছিল কেবল মানবিক দুর্বলতার দাবির বশে; কারণ অপরপক্ষে তাওয়াক্কুলকে তিনি বিন্দুমাত্র হাতছাড়া করেননি। তাঁর দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ ছিল এবং সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে আল্লাহ তা'লা আমাকে কখনোই বিনষ্ট করবেন না। তিনি নিরাশা বা হতাশাকে কাছে ঘেষতে দেননি। এমন ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা আসাও মানুষের চারিত্রিক উৎকর্ষতা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই আবশ্যক; কিন্তু মানুষের উচিত হতাশাকে কাছে ভিড়তে না দেওয়া। কারণ 'ইয়াস' বা নৈরাশ্য হলো কুফর আর আর নিরাশা-হতাশা হলো কাফেরদের বৈশিষ্ট্য। মানুষের মনে নানা প্রকার চিন্তাভাবনা অস্থিরতা ও কুমন্ত্রণা সৃষ্টি করে থাকে, কিন্তু ঈমান সেই কুমন্ত্রণা দূর করে দেয়। মানবীয় দুর্বলতা ব্যাকুলতা সৃষ্টি করে, আর ঈমান তা প্রতিহত করে।

এরপর মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের সেই বিখ্যাত ঘটনা রয়েছে –যখন মহানবী (সা.)-কে নিঃসঙ্গ পেয়ে এক শত্রু তাঁর ওপর তরবারি উঁচিয়ে ধরেছিল, তখন তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষা করবেন।

এই ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-ও নিজের অনবদ্য ভঙ্গিতে লিখেছেন, মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের অবস্থা এমন ছিল যে, যখন এক ব্যক্তি তাঁকে একাকী পেয়ে তাঁর ওপর তরবারি উঁচিয়ে ধরল এবং জিজ্ঞেস করল, এখন তোমাকে আমার হাত থেকে কে রক্ষা করবে? সেসময় মহানবী (সা.) সম্পূর্ণ নিরস্ত্র থাকা সত্ত্বেও এবং শায়িত অবস্থায় নড়াচড়া করার সুযোগ না থাকা সত্ত্বেও পরম প্রশান্তচিত্তে ও ধীরস্থিরভাবে জবাব দিলেন, আল্লাহ! এই শব্দটি এত সুদৃঢ় ঈমান ও বিশ্বাসের সাথে তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল যে, সেই কাফেরের হৃদয়ও মহানবী (সা.)-এর ঈমানের উচ্চতা এবং বিশ্বাসের পূর্ণতাকে স্বীকার না করে পারল না আর তার হাত থেকে তরবরি খসে পড়ল। যে তাকে হত্যা করতে এসেছিল, সে অপরাধীর মতো মহানবী (সা.)-এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকে!

খন্দকের বা পরিখার যুদ্ধে মুসলমানরা চরম অভাব-অনটনের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত করছিল। মদীনায় থেকে শত্রুর মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল আর এটি কোনো ভয় বা আল্লাহ তা'লার প্রতি ভরসার অভাবে ছিল না বরং তা ছিল একটি রণকৌশলের অধীনে। তখন মদীনার চারপাশে পরিখা খনন করা হয়েছিল যেন শত্রুদের অকস্মাৎ আক্রমণের মুখে পরিখার কল্যাণে নিরাপদ থাকা যায়। মুসলমানদের অধিকাংশই ছিলেন গরীব এবং খেটে খাওয়া মানুষ। এই দরিদ্রতা সত্ত্বেও সবাই সমবেত হয়ে এই পরিখা খননে অংশগ্রহণ করেন যেন এই আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকা যায়। যারা দিনমজুরী করতে পারতেন না তারা ক্ষুধার্ত থাকতেন। সেই সময় সারা আরবের বহু গোত্র একত্রিত হয়ে আক্রমণ করেছিল।

বিভিন্ন রেওয়ায়েতে তাদের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন উল্লেখ করা হয়েছে। যাহোক, এই সংখ্যা ন্যূনতম দশ হাজার বলা হয়ে থাকে। কোথাও পনেরো হাজার আবার কোথাও চব্বিশ হাজার বলা হয়েছে। দশ হাজার সংখ্যাটিও মদীনার জনসংখ্যার নিরিখে অনেক বড়ো ছিল। এই ছোটো শহরের নিরিখে এটি বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল। যাহোক, মুসলমানরা নিজেদের অভাব-অনটন এবং দারিদ্র সত্ত্বেও এই যুদ্ধের জন্য এবং সংখ্যায় নগণ্য হওয়া সত্ত্বেও এত বিশাল সৈন্যদলের মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। আর স্বল্পসংখ্যক হবার কারণে শহরের অভ্যন্তরে থেকে মোকাবিলা করার কৌশল অবলম্বন করা হয় । আল্লাহ্ তা'লার এটিও অনুগ্রহ ছিল যে, আল্লাহ তা'লা আগেই বিষয়টি জানিয়ে দিয়েছিলেন। মুসলমানদের ঈমানে দৃঢ়তা এসে গিয়েছিল এবং শত্রুর সংখ্যাধিক্য দেখে তাঁরা বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি; বরং মহানবী (সা.)-এর তাওয়াক্কুল সেসময় মুসলমানদের তাওয়াক্কুলকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছিল। বিরোধীদের ও মুনাফিকদের নানারকম বিদ্রূপ কথাবার্তা শোনা সত্ত্বেও তাঁদের মনোবল ভেঙ্গে পড়েনি। অতঃপর দেখুন! অবিচলতা এবং তাওয়াক্কুলের ফলে আল্লাহ তা'লাও এমন ব্যবস্থা করলেন যে, ধূলিঝড় এবং ঝঞ্ঝাবায়ু কাফিরদের ভীতসন্ত্রস্ত করে তোলে আর তারা পলায়ন করে। এমন হতবিহ্বলতা ও হুলুস্থুল পরিস্থিতির মধ্যে পলায়ন করে যে, বিপুল পরিমাণে নিজেদের রসদ ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ফেলে রেখে পালিয়ে যায় যা মুসলমানদের কাজে আসে। অতএব এই ছিল আল্লাহ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল করার ফলাফল।

আহযাব বা পরিখার যুদ্ধে অল্প খাবারে পুরো বাহিনীর তৃপ্ত হওয়ার ঘটনাও দেখতে পাওয়া যায়। তা যেমন ছিল একদিকে মুজিযা, অন্যদিকে মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের এক মহান দৃষ্টান্ত। এক রেওয়াতে রয়েছে, হযরত জাবের বিন আবদুল্লাহ্ আনসারী (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমরা খন্দকের যুদ্ধের দিনে মাটি কাটছিলাম, এমন সময় এক শক্ত পাথর সামনে এসে পড়ে। সাহাবীগণ নবী করীম (সা.)-এর নিকট এসে নিবেদন করেন, খন্দকে একটি শক্ত পাথর বেরিয়ে এসেছে। তিনি (সা.) বলেন, আমি নামছি অর্থাৎ, তিনি নিজে পাথরটি ভাঙতে এলেন। তিনি উঠে দাঁড়ালেন আর সেসময় তাঁর পেটে পাথর বাঁধা ছিল। খালি পেট হওয়ার কারণে সেই যুগে পেটে পাথর বেঁধে রাখা হতো যেন শক্তি বোধ হয়। টানা তিন দিন আমরা কিছুই খাইনি– অনাহারের এ ছিল চিত্র! নবী করীম (সা.) কোদাল হাতে নিয়ে পাথরটিতে আঘাত করলেন, সেটি গড়িয়ে পড়া বালুর স্তূপের মত হয়ে যায় বা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। হযরত জাবের বলেন, মহানবী (সা.)-এর এমন করুণ অবস্থা দেখে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমাকে বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দিন। আমি গিয়ে আমার স্ত্রীকে বললাম, আমি মহানবী (সা.)-এর মাঝে এমন একটি বিষয় দেখেছি যা সহ্য করা যায় না। *অর্থাৎ আমি দেখেছি, ক্ষুধা লাঘবের জন্য তিনি পেটে পাথর বেঁধে রেখেছেন।* তোমার কাছে কি কোনো খাবার আছে? তিনি বললেন, কিছু ভুট্টা আর ছাগলের একটি ছোটো বাচ্চা আছে। অতএব আমি সেই ছানাটি জবাই করি এবং তিনি (আমার স্ত্রী) ভুট্টা পিষে নেন। আমরা পাথরের হাঁড়িতে মাংস চড়িয়ে দেই। এরপর মহানবী (সা.)-এর কাছে আসি। ততক্ষণে আটা পিষা হয়ে গেছে, খামির তৈরি হয়ে গেছে আর উনুনে হাঁড়ির রান্না প্রায় শেষ হতে চলেছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল (সা.)! আমার ঘরে কিছু খাবার আছে। হে আল্লাহর রসূল! আপনি আসুন আর দু'এক জনকে সাথে নিন যেন খাবার খেতে পারেন। তিনি (সা.) জিজ্ঞাসা করেন, কতটুকু খাবার আছে? আমি তাঁকে বিস্তারিত বললাম। তিনি (সা.) বললেন, অনেক। একটি ছাগলের বাচ্চার মাংস আর সামান্য কিছু যব আছে, কোনো সমস্যা নাই, অনেক খাবার, যথেষ্ট আছে এবং এটি উত্তম খাবারও বটে।

এরপর তিনি আমাকে বললেন, তোমার স্ত্রীকে গিয়ে বলো, আমি না আসা পর্যন্ত যেন চুলা থেকে পাতিল না নামায় এবং তন্দুর থেকে রুটি না বের করে। এরপর নবী করীম (সা.) সাহাবীদের বললেন, ওঠো! তদনুসারে মুহাজির ও আনসারগণ উঠে দাঁড়ালেন। হযরত জাবের স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন, তোমার মঙ্গল হোক! নবী করীম (সা.) মুহাজির, আনসার এবং তাঁদের সাথে যারা আছেন সবাইকে সাথে নিয়ে চলে এসেছেন! তাঁর স্ত্রী বললেন, হুযূর (সা.) কি আপনার কাছে খাবারের পরিমাণ জিজ্ঞেস করেছিলেন? জাবির বললেন, হ্যাঁ, আমি সব বিস্তারিত বলেছি। মহানবী (সা.) সাহাবীদের সাথে নিয়ে এসে বললেন, ভেতরে প্রবেশ করো, তবে হুড়োহুড়ি করো না অর্থাৎ, তাড়াহুড়ো না করে শান্তভাবে ভেতরে গিয়ে বসো। তিনি রুটির টুকরো নিয়ে তাতে মাংস ঢেলে সাহাবীদের দেয়া আরম্ভ করেন। কাপড়ে ঢাকা রুটি টুকরো করে সামান্য মাংস তুলে সাহাবীদের পরিবেশন করতেন। পাতিল ও তন্দুর থেকে যখনই কিছু নিতেন, তা আবার ঢেকে দিতেন। এভাবে তিনি করতে থাকেন যতক্ষণ না সকল সাহাবীর পূর্ণ তৃপ্তি হয়। সকলের পেট ভরে গেল এবং তখনও কিছু খাবার বেঁচে গেল! রসূলুল্লাহ (সা.) হযরত জাবেরের স্ত্রীকে বললেন, নাও, এবার তোমরা খাও এবং অন্যদেরও উপহারস্বরূপ পাঠাও, কারণ মানুষ চরম অনাহার ক্লিষ্ট। অতএব একদিকে যেমন ছিল পরম তাওয়াক্কুল, অন্যদিকে ছিল বরকতের দোয়া –যার ফলে খাবারে বিপুল বরকত হয়েছিল।

পুনরায় এক রওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি হযরত বারাআ বিন আযেব (রা.)-কে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি হুনাইনের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সা.)-কে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন?' তিনি বললেন, হ্যাঁ, তবে রসূলুল্লাহ (সা.) ময়দান ছেড়ে যাননি। হাওয়াযিন গোত্র ছিল তিরন্দাজ। যখন তাদের সাথে সংঘর্ষ আরম্ভ হয় আমরা তাদের আক্রমণ করলাম, তারা পরাস্ত হলো। মুসলমানরা গণিমতের মাল সংগ্রহ করতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু শত্রু হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে তির বর্ষণ শুরু করে দিল। রসূলুল্লাহ (সা.) নিজ স্থান থেকে একচুলও নড়েননি। আমি দেখেছি, তিনি তাঁর সাদা খচ্চরে আরোহিত ছিলেন এবং আবু সুফিয়ান বিন হারিস বিন আব্দুল মুত্তালিব এর লাগাম ধরে রেখেছিলেন। আর নবী করীম (সা.) এই কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন, أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ * أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ "আমি প্রতিশ্রুত নবী, এতে কোনো মিথ্যা নেই, আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র।" এই ঘটনার উল্লেখ হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-ও করেছেন এবং কিছুটা বিস্তারিত বর্ণনা করে বলেছেন, মহানবী (সা.)-এর এই কথা বলা যে আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান, পুত্র"। সে সময় শত্রুর আক্রমণ এতটাই তীব্র ছিল যে, শত্রুর চার হাজার তিরন্দাজ বৃষ্টির মত তির ছুড়ছে আর এ অবস্থায় আমার সামনে এগিয়ে যাওয়া মানবীয় শক্তির অতীত বিষয় আর আমার কোনো ভয় নেই! এর অর্থ কিন্তু এটা নয়। তিনি (সা.) কবিতাটি পড়েছিলেন–যাতে কেউ ধোঁকা না খায়, যেন এমন মনে না করে যে আমার মধ্যে কোনো ঐশী শক্তি রয়েছে। আমি তো আবদুল মুত্তালিবের পুত্রই এবং একজন মানুষ। শুধু আল্লাহ তা'লার সাহায্য আমার নবী হওয়ার কারণে আমার সঙ্গে আছে।মহান আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুলের মহিমা হলো, যেহেতু আল্লাহ আমাকে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাই তিরের এই বৃষ্টির মধ্যেও তিনি আমাকে বিজয়ী করবেন!

আল্লাহ তা'লার ওপর তাওয়াক্কুল এবং তাঁর প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাসের আরও একটি উদাহরণ রয়েছে। একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, প্রারম্ভিক ঘটনাগুলো দেখুন বা জীবনের শেষ দিকের ঘটনাগুলো দেখুন–একই তাওয়াক্কুলের উদাহরণ সর্বত্র দেখা যায়। এটি বদরের যুদ্ধের ঘটনা, প্রথম যুদ্ধের ঘটনা। মদিনায় হুবাইব বিন ইউসাফ নামের একজন অত্যন্ত শক্তিশালী

ও সাহসী ব্যক্তি ছিল। তখন মুসলমানদের অবস্থা খুবই নাজুক ছিল। এই ব্যক্তি খাজরাজ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং বদরের যুদ্ধের আগ পর্যন্ত ইসলাম গ্রহণ করেনি। কিন্তু সে তাঁর গোত্র খাযরাজের লোকদের সঙ্গে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। যুদ্ধ জয় হলে গনীমতের মাল লাভ করবে– এমন আশাও তার ছিল। মুসলমানেরা এতে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলেন যে, সে-ও তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু মহানবী (সা.) তাঁকে বললেন, 'আমাদের সঙ্গে কেবল সেই ব্যক্তিই যুদ্ধে যাবে, যে আমাদের ধর্মের অনুসারী।' একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হুযূর (সা.) তাকে বলেছিলেন, 'তুমি ফিরে যাও। আমরা কোনো মুশরিকের সাহায্য গ্রহণ করতে চাই না।' হুবায়ব বিন ইউসাফ (রা.) দ্বিতীয়বারও হযরত মহানবী (সা.)-এর কাছে এলেন। কিন্তু হুযূর (সা.) দ্বিতীয়বারও তাকে ফেরত পাঠান। অবশেষে তৃতীয়বার সে যখন আসে, তখন মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখ?' সে বললো, 'হ্যাঁ।' এরপর সে ইসলাম গ্রহণ করে এবং অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

অতএব তিনি (সা.) এই প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং চরম প্রয়োজনের মধ্যেও অবিশ্বাসী থাকা অবস্থায় সেই ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করেননি। কারণ, তিনি মনে করতেন যে, এভাবে কোনো অমুসলিমের সাহায্য গ্রহণ করা আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতিসমূহের প্রতি বিশ্বাস এবং তাঁর ওপর তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন:

"অধুনাকালের বুদ্ধিমান লোকদের দৃষ্টিতে কাউকে নিজের শত্রু বানানো একটি ভুল। কিন্তু সত্য কথা হলো এটিও সত্যতার একটি নিদর্শন। তোমরা দেখো, মহানবী (সা.) কারও কপটতামূলক বন্ধুত্ব রাখেননি অর্থাৎ প্রত্যেকেই তাঁর শত্রু হয়ে যায়। সত্য বলার কারণে সকলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কেননা কেউ সত্য কথা শুনতে চাইতো না তাই মানুষের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। এই লোকদের দৃষ্টিতে তো নাউযুবিল্লাহ তিনি (সা.) ভুল করেছিলেন। অথচ কেবল আল্লাহর জন্য সকলের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়াই তাঁর সত্যতার সুস্পষ্ট প্রমাণ। এর দ্বারা তাঁর ঈমানী শক্তির অবস্থা জানা যায়।

একদিকে তিনি (আ.) হযরত ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেন, 'দেখো, ইনজিলসমূহে যে শিক্ষা পাওয়া যায়। অনেকে এ প্রেক্ষাপটে আপত্তি করে তাই তিনি বলছেন যে 'ইনজিলে যে শিক্ষা রয়েছে, আমি তারই আলোকে কথা বলছি।' এতে প্রতীয়মান হয় যে, কাউকে অসন্তুষ্ট করা কোনোভাবে তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট ছিল না। ইহুদীদের বলা হয়েছিল, 'আমি তাওরাতের একটি হরফও পরিবর্তন করতে আসিনি।'

এর বিপরীতে মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীর এমন কোনো ফিরকা বা ধর্ম দৃষ্টিগোচর হবে না, যাকে তিনি ইসলামের প্রতি আহ্বান জানান নি এবং যার অসারতা তিনি প্রমাণ করেননি। আর এর পাশাপাশি প্রত্যেকের মোকাবিলায় তিনি নিজের সফলতাও ঐশী সাহায্য লাভের দাবিও করেছেন। তিনি শুধু ভুল-ক্রুটি চিহ্নিত করেননি; বরং তিনি এই দাবিও করেছেন যে, 'আল্লাহ্ তা'লার প্রতি আমার পূর্ণ বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল রয়েছে এবং ইনশাআল্লাহ্ আমি সফলতা অর্জন করবো, কারণ আমি তাঁর পক্ষ থেকে এসেছি।' তিনি (আ.) বলেন, 'তাহলে তোমরা বলো, যতক্ষণ পর্যন্ত কারো আল্লাহ্ তালার প্রতি পূর্ণ ভরসা ও বিশ্বাস না থাকে, সে কি কখনোও এমনটি করতে পারে?'

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ وَسَلِّمْ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)